ড. এ.কে. এনামুল হক

অপচয়ের অর্থনীতি : সবাই জাতীয় আয় বৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত!

শুরু হয়েছিল ভোটার পরিচয়পত্র দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল ভোটার সংখ্যা যেন সঠিক হয়। তখন আমার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। যে দেশে নাগরিকত্বই ঠিক নেই, সে দেশে ভোটার পরিচয়পত্র কেবল অর্থের অপচয় মাত্র। ঘটা করে শুরু হওয়া কার্যক্রমের একটি ভালো দিক ছিল, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচয় সংগ্রহ করা। বাসায় দুজন কর্মী এলেন। তাদের পরিচয় জানতে চাইলাম। জানালেন শিক্ষক। শুরু হলো নাম ও পরিচয় সংগ্রহের পর্ব। প্রথমে আমার। আপনার নাম? বললাম। পিতার নাম? বললাম। তিনি কি জীবিত না মৃত? প্রশ্নটি শুনে ভড়কে গেলাম। মৃত বা জীবিত পিতার নাম কি পৃথক হয়? ভদ্রমহিলারা বেশ কথা বলেন। না স্যার, তিনি মৃত হলে নামের আগে মৃত লিখে দেব। কেন? জীবিত থাকলে কি তার নামের পাশে 'জীবিত' লিখে দেবেন? না তা নয়, তবে মৃত হলে 'মৃত' লেখাই নিয়ম। ঠিক বুঝলাম না, কোথায় পেলেন এই নিয়ম? জীবিত না মৃত—এমন কোনো প্রশ্ন নেই আপনার ফরমে কিন্তু এই অবান্তর প্রশ্নটি করছেন কেন? বিষয়টি ওখানেই থামল। বললাম এ মুহূর্তে আমার ভোটার হওয়ার ইচ্ছা নেই। বাদ দিন এত সব ব্যাখ্যার, তবে পিতার নাম জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তিনি জীবিত না মৃত—এমন প্রশ্ন যখন করছেন তখন আমার এই কার্ডের দরকার নেই। শিক্ষকরা তবুও বললেন, আমরা তথ্য নিলাম, আপনাকে অমুক তারিখ কেন্দ্রে গিয়ে আঙুলের ছাপ ও ছবি দিয়ে আসতে হবে। এবার এল আমার স্ত্রীর তথ্য সংগ্রহে। তিনি স্কুলের শিক্ষক, তখন বাসায় ছিলেন না। বললেন, আপনি তথ্য দিলেই চলবে। নাম? বললাম। অতঃপর নিজ মনেই বললেন পিতার নাম লাগবে না, আপনার নাম হলেই চলবে। আমিও বেয়াড়া বান্দা। স্ত্রীর ক্ষেত্রে পিতার নাম কেন নিলেন না? না, আপনি তো রয়েছেন। ঠিক বুঝলাম না। না, তিনি তো আপনার সঙ্গেই থাকেন। তাই লাগবে না। কিন্তু আমিও তো তার সঙ্গেই থাকি। তাই আমার সময় কেন স্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করলেন না? ফরমে তা লাগে না। তবে নারীর ক্ষেত্রে স্বামী অথবা পিতার নাম লাগবে। আর লাগবে মাতার নাম। বললাম, আপনারা নিজেরা স্কুলশিক্ষিকা। নারী হয়েও কি বুঝতে পারছেন না এই প্রশ্ন কতটা অসম্মানজনক? নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে প্রশ্নের ভিন্নতা থাকবে কেন? তারা গজগজ করতে করতে চলে গেলেন।

প্রসঙ্গটা টানলাম কারণ পত্রিকার সংবাদে বোঝা যাচ্ছে যে ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে এখন সবাই চিন্তিত। কভিডের ভুয়া টেস্ট তৈরি করতে জড়িত ছিলেন এক ডাক্তার, তার নাকি ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র ছিল। আর তার দায় তাকেই নিতে হয়েছে। যারা তৈরি করল, বিতরণ করল, তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তালি কি এক হাতে বেজেছিল? এক সময়ের ভোটার পরিচয়পত্র ক্রমে নাম পাল্টিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র হয়েছে। কিন্তু ঘর বদলায়নি। জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির ক্ষমতা কার থাকা উচিত, তা নিয়ে না ভেবেই আমরা তা রেখেছি নির্বাচন কমিশনের হাতে। দেশের টানাপড়েনের একটি কারণ ছিল ভুয়া ভোটার, যা তৈরি হতো বা হয় ভোট চুরির ইচ্ছা থেকে। ভোট চুরি আর জাতীয় পরিচয় চুরি এক কথা নয়। ভোটার পরিচয়পত্র আমরা কেবল ভোটের দিন ব্যবহার করে থাকি, তাই এই একদিনের জন্য এত বড় প্রকল্প গ্রহণ কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল, তা নিয়ে আমার প্রশ্ন সবসময়ই ছিল। তবে জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবহার বহুবিদ। বাড়ি কিনবেন, গাড়ি কিনবেন, পাসপোর্ট করবেন, স্কুলে ভর্তি হবেন, কর দেবেন— সব কাজেই জাতীয় পরিচয়পত্র লাগে। এমনকি সরকারের আর্থিক প্রণোদনা পেতে গেলেও তা লাগে। ভুয়া ভোটার হওয়া আর ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা এক জিনিস নয়। বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যখন প্রধানমন্ত্রী কভিডের প্রণোদনা পাঠাতে গেলেন তখনই। আমরা সবাই বুঝতে পারলাম যে জাতীয় পরিচয়পত্রেও ভুয়া ভোটারের ভূত চেপে বসেছে। আর তার ফলে সরকারের ডিজিটাল প্রণোদনার বারোটা বেজেছে আর তাতে প্রধানমন্ত্রী জাতির কাছে বিব্রত হয়েছেন। বিষয়টি ভালো ঠেকেনি। তবে দায় কেউ নেয়নি।

গণমাধ্যমের খবর, এক নারী কভিড টিকা দিতে গিয়ে দেখেন তিনি মৃত। জীবিত ব্যক্তি মারা গিয়ে পুনর্জন্ম নিয়েছেন, তা মহাকাব্যে পড়েছিলাম, তবে বাস্তবে এই প্রথম জানলাম। বিষয়টি অবশ্য অস্বাভাবিক নয়, কারণ ভুয়া ভোটার তৈরির কারখানার কারিগররাই যখন জাতীয় পরিচয়পত্রের হিসাব সংরক্ষণ করেন, তখন এটাই যে হবে তা বলা বাহুল্য। এর আগে 'মৃত নানা ভোট দিয়ে গেছেন' জেনে নাতির আক্ষেপ নিয়ে কৌতুকটি শুনেছিলাম। নাতি বলেছিল, 'নানা, তুমি ভোট দিয়ে গেলে কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলে না!' তা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে যে প্রচেষ্টা, তার এই অবস্থা দেখে আপনার কি মনে হয় না আমরা হাজার হাজার কোটি টাকা শেষ পর্যন্ত জলে ফেলেছি? তবে কেউ দায়ী হয়নি। আমাদের দেশে দায়ী হন কেবল রাজনীতিকরা!

প্রথম কথা, ভোটার হওয়া আর জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা এক বিষয় নয়। ভোটকার্যে জড়িত সংস্থা তা বুঝতে অক্ষম। তাই ভোটার হওয়ার বয়সের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্রের সংযোগ কাম্য নয়। যে শিশুটি স্কুলে যাবে, তারই জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে নাগরিক অধিকার শুরু করা উচিত। এর সঙ্গে ভোটার হওয়ার সংযোগ নেই। দ্বিতীয়ত, এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যাদের আর কোনো কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে না। তাদের কাজ একটাই, প্রতিটি শিশুর স্কুলে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গেই তার জাতীয় নিবন্ধন তৈরি হবে। তাই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

আমার ছেলের জাতীয় পরিচয়পত্রের গল্পটি বলি। তাতে বুঝবেন কোন 'উজবুকের' পাল্লায় আমরা পড়েছি। ছেলের জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করা দরকার। অনলাইনে ফরম পূরণ করার পর কোনো ডাক আসে না। শেষ পর্যন্ত আমার এক ছাত্রের সহায়তা নিলাম। তার চেষ্টায় তথ্য হালনাগাদ করতে তাদের কার্যালয়ে ছেলের ডাক পড়ল। সব তথ্য দেয়া হলো। পিতার নাম, মাতার নাম ইত্যাদি। পরিচয়পত্র পাওয়ার পর দেখা গেল পিতার অর্থাৎ আমার জাতীয় পরিচয় নম্বর ঠিক থাকা সত্ত্বেও আমরা নামটি ভুল ছাপা হয়েছে। যারা ন্যূনতম কম্পিউটার জানেন, তাদের কাছেও তা নিতান্ত ভুতুড়ে মনে হবে। কারণ নাম্বার ঠিক থাকা সত্ত্বেও কী করে নামের বানান ভুল হয়? তার অর্থ, যারা কার্ডটি তৈরি করেন তারা নিজেরা তা আবার টাইপ করেন; যা বেমালুম সময় ও অর্থের অপচয়। অথচ তাই চলছে বলেই মনে হয়েছে। পৃথিবীতে সব অসম্ভবই কি আমাদের দেশে সম্ভব!

বাড়ি যাচ্ছিলাম। ৩০০ ফুট রাস্তা ধরে। রাস্তাটির কোনো নাম নেই, নাম্বারও নেই। রাস্তায় উঠে বুঝলাম কী ভুলই না করেছি! এই সেদিন তৈরি হয়েছে রাস্তাটি। সম্ভবত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে তা কিছুটা চালুও হয়েছিল, তবে বর্তমান সরকারের আমলেই তা পূর্ণ হয়। কিন্তু এখন ওখানে গেলে দেখবেন ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। রাস্তার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। মাত্র দশ বছরে একটি রাস্তার এই পরিণতি দেখে আপনার কষ্ট হবে। ভাববেন না রাস্তাটি ভেঙে গেছে। তা নয়। আমরা পয়সা খরচ করে রাস্তাটি ভাঙছি। নতুন রাস্তা তৈরি করতে হবে। কী অপরাধ ছিল এমন একটি ১০-১২ বছরের কিশোর রাস্তার? হয়তোবা প্ল্যান বদলে গিয়েছে! হয়তোবা নতুনদের কাজ দিতে হবে তাই ভাঙতে হচ্ছে। কী কারণ তা আমরা জানি না। তবে রাস্তাই বিলীন হয়েছে। অথচ দায় কেউ নেয়নি।

গণমাধ্যমের খবর, ব্রিজটি ভেঙে ফেলা হবে জেনেও কাজ চলছে পূর্ণোদ্যমে। পটুয়াখালীতে নয়? খোদ ঢাকায়। ঢাকার বৃত্তাকার নৌপথ তৈরি হবে। তাতে প্রায় ১৬টি সেতু ভেঙে ফেলা হবে। তার মধ্যে তুরাগের ওপর একটি, যার নিচ দিয়ে নৌকাও যায় না। তাই সেতুটি ভাঙতে হবে। তবে সেখানে এখন নতুন সেতুর কাজ চলছে। সংবাদ তথ্যমতে, তাও নাকি ভাঙতে হবে! আপনি যদি সেতু নির্মাতা ঠিকাদার হোন, তবে রাত-দিন কাজ করে সেতুটি নির্মাণ করবেন, কারণ তা না হলে কাজটা বন্ধ হয়ে যাবে আর আপনার আর্থিক ক্ষতি হবে। যতটুকু কাজ হয়েছে ততটুকু কাজের জন্যই তো বিল পাবেন? তাই 'ব্যবসা'র সফলতা দেখতে চাইলে আপনি অতিদ্রুত কাজটি শেষ করতে চাইবেন। কথায় বলে, দান এক হাতে দিলে অন্য হাত যেন তা টের না পায়। আমাদের সরকারি অফিসগুলোও সে রকম। যেহেতু কাজ বন্ধের কোনো নির্দেশনা আসেনি, তাই কাজ চলুক। ভাঙতে হলে ভাঙার জন্য অন্য ঠিকাদার লাগবে। আরো অর্থ লাগবে। তৈরি না হলে তো খরচ হবে না। তাই কাজ চলুক। অপচয় কত প্রকার বুঝতে হলে এ দেশেই কি জন্মাতে হবে!

বলছিলাম ছেলের জাতীয় পরিচয়পত্রের কথা। তাকে বললাম, ডিজিটাল বাংলাদেশে একবার ডিজিটাল প্রচেষ্টা করো। নিজেই সে নতুন করে নাম সংশোধন করার ফরম পূরণ করল। নাম ভুলের কোনো ব্যাখ্যা দিতে হলো না। কারণ কর্তৃপক্ষ হয়তোবা জানে যে দায় স্বীকারের কোনো প্রয়োজন এ দেশে নেই। আমার দেয়া তথ্য ভুল নয়, আমি পরিচয়পত্রটি ছাপিনি অথচ এখন আমাকেই তা সংশোধনের জন্য 'আবেদন' করতে হবে! সেও তা-ই করল। পোর্টালটি জানাল ১৫ দিন পর জানাবে। বুঝতে বাকি রইল না যে সবটাই ডিজিটাল নয়। পেছনে মানুষের ক্ষমতা রয়েছে। তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে ১৫ দিন সময় লাগবে। ২০ দিন পর ছেলে বলল, তোমার কোনো ছাত্র আছে কি? আমাকে তো কোনো উত্তর দেয়নি। বললাম, আচ্ছা দেখি। পরদিনই তার কাছে সংবাদ এল—কাজ হয়েছে। আমার কিছু করতে হয়নি। ডিজিটাল ব্যবস্থায়ই হয়েছে। হাফ ছেড়ে বাঁচলাম আর মনে মনে প্রশংসা করলাম কর্তৃপক্ষের। তারা কোনো তদবির ছাড়াই কাজটি করেছে। এ দেশে এও সম্ভব।

এতগুলো উদাহরণ দিলাম একটি বিষয় স্পষ্ট করার জন্য। অপচয় কিন্তু জাতীয় আয়ের অংশ। যত অপচয় করবেন ততই আমাদের জাতীয় আয় বাড়বে। অর্থনীতিবিদরা যখন জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তখন ভাবেননি জাতীয় অপচয়ের কথা। কারণ জাতীয় আয় বা জিডিপি মানেই হলো জাতির উৎপাদনের পরিমাপ করা। রাস্তাটি যখন তৈরি হলো তখন যা খরচ করা হয়েছে, তা কিন্তু জাতীয় উৎপাদনের অংশ ছিল। রাস্তাটি যখন ভাঙতে হলো তখনো আমাদের খরচ জাতীয় আয়ের অংশ। কারণ রাস্তা ভাঙাটাও একটি কাজ ও একটি খরচ। তাই তাতে জাতির আয় বাড়ে। সেতুটি যখন ভাঙতে হবে, তাতে জাতীয় আয় বাড়বে। অযথা সেতুটি নির্মাণ করতে হলে তাতেও জাতীয় আয় বাড়বে। পরিচয়পত্রে যত ভুল হবে ততই জাতীয় আয় বাড়বে, কারণ ভুল সংশোধন করতে গিয়ে ইন্টারনেট সময় লাগবে, কাগজ লাগবে, আমাকে কর্তৃপক্ষের অফিসে যেতে হবে। তাতেও খরচ হবে। ঘুষ দিলেও জাতীয় আয় বাড়বে। কারণ ঘুষ পণ্য বা সেবার দামের সঙ্গে জুড়ে দেবেন ব্যবসায়ীরা। সম্ভবত এজন্যই আমাদের দেশে ভুলের দায় নেয়ার প্রশ্নই আসে না। আমরা সবাই তো জাতীয় আয় বৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত। উন্নত দেশ মানেই অধিক আয়। তাই কি? আশা করি ভাববেন।

অর্থনীতিবিদরা যখন জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তখন ভাবেননি জাতীয় অপচয়ের কথা। কারণ জাতীয় আয় বা জিডিপি মানেই হলো জাতির উৎপাদনের পরিমাপ করা। রাস্তাটি যখন তৈরি হলো তখন যা খরচ করা হয়েছে, তা কিন্তু জাতীয় উৎপাদনের অংশ ছিল। রাস্তাটি যখন ভাঙতে হলো তখনো আমাদের খরচ জাতীয় আয়ের অংশ। কারণ রাস্তা ভাঙাটাও একটি কাজ ও একটি খরচ। তাই তাতে জাতির আয় বাড়ে

ড. এ.কে. এনামুল হক : অর্থনীতির অধ্যাপক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ও পরিচালক এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট